পলাশীর মোহনলাল



পলাশীর মোহনলাল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম ঃ এক টাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিঃ ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬, হইতে মুদ্রিত।

পলাশীর মোহনলাল

১

বাংলা ছিল তখন সোনার দেশ। কাননে-প্রান্তরে তার সোনার ফসল, ঘাটে-বাটে তার ঐশ্বর্য-সম্ভার ; সুস্থ সবল অধিবাসীদের মুখে হাসি আর আনন্দ যেন ধরিত না। কাহারও কোন অভাব ছিল না, কাহারও কোন দুঃখ ছিল না। সবার ঘরেই সুখ ছিল, সবার ঘরেই শান্তি ছিল। বাংলায় তখন সব ছিল—গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, বাগানভরা তরকারি, আর পুকুরপোরা মাছ। দেশে তখন অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না ;—বাণিজ্যের স্বর্ণলক্ষ্মী বাংলার ঘরে ঘরে হাসিতেন, বাঙালী সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙা মধুকর বাংলার পণ্য বুকে বহিয়া, উজান ঠেলিয়া, জোয়ারে ভাসিয়া কোথায় কোন্ দূর-দূরান্তর দেশে বাণিজ্যে যাইত ; কিছুদিন পরে সোনারূপায় বুক ভরিয়া আবার বাংলার তীরে ফিরিয়া আসিত। বাংলার মাঠে মাঠে তখন হেমন্তের প্রথম প্রভাতেই লক্ষ্মী-মায়ের সোনার ঝাঁপি খুলিয়া যাইত,—সোনার বরণ ধানের শীষ্ বাতাসে দুলিত, রৌদ্রে জ্বলিত। সেদিন বাংলার বুকে সৌন্দর্য ছিল, বাঙালীর ঘরে ঐশ্বর্য ছিল। সে-যুগ ছিল যেন সোনার যুগ।

তখনকার দিনে বাঙালীর প্রাণগুলি ছিল সরল উদার, দেহগুলি ছিল সতেজ সবল। লোকে তখন আজিকার মত 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইত না। সে-সময়ে লোকের অভাব ছিল না, কাজেই দুঃখও ছিল না। তখন মোটা ভাত আর মোটা কাপড় সবার ঘরেই ছিল। লোকে আপন-আপন ঘরে বসিয়া প্রসন্ন মনে যে যাহার কাজ করিত; অবসর সময়ে হাতে-লেখা তুলট কাগজের রামায়ণ-মহাভারত পড়িত, কিংবা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিয়া অথবা কথকতা শুনিয়া সময় কাটাইত। ছেলেরা গ্রামের পাঠশালে গুরুমহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিখিত; আর ছাড়া পাইলেই মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া, পাড়ায় পাড়ায় দাপাদাপি করিয়া, ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া, বর্ষার জলে নদ নদী খাল বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া, সাঁতার কাটিয়া, গৃহস্থের গরুবাছুর চরাইয়া, হাটবাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে তাঁহার স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকেরা লাঠি ঘুরাইয়া, কুস্তি লড়িয়া, তলোয়ার ভাঁজিয়া, কেহ কেহ বা দিবানিদ্রা দিয়া অথবা রাজসরকারে কিংবা জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করিয়া দিন কাটাইত।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মুসলমানের রাজত্ব। মুসলমান বাদ্‌শা দিল্লীতে থাকিতেন, আর দিকে দিকে তাঁহার এক একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিতেন। তাঁহারাই

বাদ্শার নামে দেশ শাসন করিতেন। এই প্রতিনিধিগণকে লোকে বলিত নবাব। নবাবের বাদ্শার মতই ক্ষমতা ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। বাংলার নবাব বাংলাতেই থাকিতেন। বাংলার ধনরত্ন বাংলায়ই থাকিত, দেশান্তরে চির-নির্বাসিত হইত না। দেশের টাকা দেশের জন্যই ব্যয় হইত ; যাহা ব্যয় হইত, দেশের লোকে তাহা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইত।

মুসলমান রাজত্বকালে বাঙালীরা ছিল বীরের জাতি। বাঙালীর শৌর্যে-বীর্যে, বাঙালীর সাহসে-শক্তিতে বাংলার মুসলমান গৌরব তখন দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ দশায় দিল্লীর বাদ্শার আর কোন ক্ষমতা ছিল না, তিনি তখন ছিলেন কেবল নামমাত্র বাদ্শা। বাংলার নবাবই ছিলেন তখন বাংলাদেশের প্রকৃত মা-বাপ। নবাব-দরবারে বাঙালীদের তখন বড় প্রাধান্য ছিল। মুসলমান আমীর-ওমরাহ্রা রাত্রিদিন আহার-বিহার আর বিলাসিতাতেই মগ্ন থাকিতেন ; কর্মকুশল বাঙালী হিন্দুরা কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহু-বিক্রমে বাংলাদেশের শাসনকার্য চালাইতেন।

বাংলা-মায়ের কোলটি তখন অফিসের কেরানীতে ভরিয়া যায় নাই। বাংলায় তখন বীর-পুরুষের অভাব ছিল না। বাঙালীর তখন হাতিয়ার ধরিবার ক্ষমতা ছিল। সে-হাতিয়ার দেখিলে স্বয়ং যমরাজেরও বুক ভয়ে কাঁপিত। আমাদেরই

মত বাঙালীর ছেলে অঙ্গে বর্ম আঁটিয়া, কোমরে তলোয়ার ঝুলাইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধে যাইত। ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া, গায়ে রক্ত মাখিয়া, কামান দাগিয়া শত্রুসৈন্য উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত।

আজ যাঁহার কথা বলিব, তিনি ছিলেন ঠিক এমনি একজন বাঙালীর ছেলে। নাম তাঁহার মোহনলাল। মোহনলাল ছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী। তিনি ছিলেন যেমনি প্রভুভক্ত, তেমনি বীর; তাই নবাব তাঁহাকে ভারি ভালবাসিতেন। নবাবের জীবনের সুখ-দুঃখের সহিত মোহনলালের জীবনের সুখ-দুঃখও জড়াইয়া গিয়াছিল। মোহনলাল নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্যই জীবন দান করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। তাই মোহনলালের কথা জানিতে হইলে সিরাজদ্দৌলার কথাও জানিতে হয়। সেজন্য মোহনলালের কাহিনীর সঙ্গে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার কাহিনীও বলিব।

॥ ২ ॥

ঐ যেখানে ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলিয়া তরঙ্গ-মুকুট মাথায় পরিয়া ভাগীরথী নদী ছুটিতেছে, উহারই পশ্চিম তীরে ছিল বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। আজও মুর্শিদাবাদ আছে, কিন্তু তাহা আর বাংলার রাজধানী নয়। আজ আর মুর্শিদাবাদে সে-হীরাঝিল নাই, সে-সৌন্দর্য নাই, সে-ঐশ্বর্যও নাই। মুসলমান রাজত্বের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সে-সবই গিয়াছে। জরাজীর্ণ মুর্শিদাবাদ যেন আজ পুত্রশোকাতুর পিতার মত গুম্ হইয়া আছে।

একদিন ছিল, যখন ঐ-মুর্শিদাবাদ গম্বুজে, মস্‌জিদে, বুরুজে, প্রাসাদে, ফুলের কুঞ্জে, জলের ফোয়ারায়, মর্ত্যের বুকে স্বর্গের মত রূপ-ঐশ্বর্যে ঝল্‌মল্ করিত। তখন সেখানে কত লোক, কত লস্কর, কত সিপাই, কত শান্ত্রী। পথের পাশে আকাশ-ছোঁওয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ; দিনে-রাতে সেখানে কত কোলাহল। কোতোয়ালের কড়া হুকুমে পথে পথে কত শান্ত্রী পাহারা; কত শত লোকের আনাগোনা।

বাংলার নবাব বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদেই থাকিতেন।

আলিবর্দী খাঁ যখন বাংলার নবাব তখন মোহনলাল ছিলেন নবাব-সরকারে সামান্য একজন কর্মচারী। রাজদরবারে তখন তাঁহার বিশেষ কোনও প্রতিপত্তি ছিল

না। কিন্তু ছোট হইতেই ক্রমে মানুষ বড় হয়। আজ যে নগণ্য, চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে কাল হয় তো সে গণ্যমান্য হয়। তাই, আলিবর্দীর মৃত্যু হইলে সিরাজদ্দৌলা যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন, তখন মোহনলালও তাঁহার যত্ন ও কার্যদক্ষতার গুণে শেষে একদিন নবাব-সরকারে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন।

নবাব আলিবর্দীর কোনও ছেলে হয় নাই—শুধু তিনটি মেয়ে। বড় মেয়েটির নাম ঘসেটী বেগম, মেজ মেয়েটির নাম কি তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না, আর ছোট মেয়েটির নাম আমিনা বেগম। আলিবর্দী তাঁহার তিনটি মেয়ের সহিত তাঁহার ভাই হাজি আহম্মদের তিনটি ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। তারপর যখন গিরিয়ার মাঠে বাংলার পূর্ব-নবাব সর্‌ফরাজ খাঁকে পরাজিত করিয়া আলিবর্দী নিজে বাংলার নবাব হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বড় জামাই নোয়াজেস্ মহম্মদকে করিলেন ঢাকার নবাব, মেজ জামাই সাইয়েদ্ আহম্মদকে করিলেন পূর্ণিয়ার নবাব, আর ছোট জামাই জয়েনুদ্দীনকে করিলেন পাটনার নবাব।

বর্গীর হাঙ্গামার কথা বাঙালী আজও ভোলে নাই। এখনও মায়েরা তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইবার সময় গাহিয়া থাকেন :—

“ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো,
বর্গী এলো দেশে।

বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজানা দেব' কিসে ?"

এই বর্গীরা ছিল মহারাষ্ট্র-দেশের লোক। মাঝে মাঝে তাহারা দলকে দল ঘোড়ায় চড়িয়া, হাতে ঢাল-তলোয়ার ধরিয়া, পঙ্গপালের মত আসিয়া এই বাংলার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িত। লুটপাট করিয়া, গ্রাম-নগর জ্বালাইয়া, ঘোড়ার খুরে ক্ষেত-খামার সব তল করিয়া, দেশের লোকের দুর্দশার একশেষ করিত। বর্গীর ভয়ে সে-সময়ে সমস্ত দেশ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিত। একা আলিবর্দী খাঁ-ই তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

নবাব আলিবর্দীর অগাধ ধনদৌলত, বিপুল রাজ-ঐশ্বর্য, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে ভোগ করিবার জন্য একটিও পুত্র হয় নাই। তাই তিনি তাঁহার ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের ছেলে মীর্জা মহম্মদকে পোষ্যপুত্ররূপে কাছে রাখিয়াছিলেন। এই মীর্জা মহম্মদই পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আলিবর্দীর আদরে-আদরে সিরাজদ্দৌলা অতি অল্প বয়সে কতকগুলি কুসঙ্গীর সহিত মিশিয়া ভারি অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও দেখিয়া ভয় করিতেন না, অথচ তাঁহাকে দেখিয়া সকলে হাড়ে হাড়ে কাঁপিত। স্নেহ-পরায়ণ বুড়া আলিবর্দী এ-সব দেখিয়াও দেখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না। সবাই বুঝিল, সিরাজদ্দৌলাই

ভবিষ্যতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইবেন। আমীর ওমরাহ্‌রা কিন্তু সবাই সিরাজদ্দৌলার উপর মনে মনে চটিতে লাগিলেন।

এদিকে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য অনবরত ছুটাছুটি করিয়া, লড়াই করিয়া বৃদ্ধ আলিবর্দীর শরীর ভাঙিয়া পড়িল। বুড়া বয়সে তাঁহার উদরী রোগ হইল। দেশ-দেশান্তর হইতে কত বড় বড় হাকিম আসিল, বৈদ্য আসিল, অন্যান্য চিকিৎসক আসিল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আলিবর্দী ঔষধ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর আর বেশী দেরী নাই।

শেষে নবাব আলিবর্দী খাঁ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সিরাজদ্দৌলাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ নবাব।

আলিবর্দীর বড় জামাই, ঢাকার নবাব, নোয়াজেস্‌ মহম্মদের বড় ইচ্ছা ছিল যে, আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তিনিই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইবেন। বৃদ্ধ নবাবের ঘোষণা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হইলেন। নোয়াজেসের পেশকার রাজা রাজবল্লভ আর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ঘসেটী বেগমের অভিভাবক হইয়া ঢাকায় রাজকার্য চালাইতে লাগিলেন।

মুর্শিদাবাদের অনতিদূরেই মোতিঝিল। আজ আর মোতিঝিলের সে-সৌন্দর্য নাই, সে-গৌরব নাই। কিন্তু একদিন ছিল—যখন মোতিঝিলের নবাব-ভবনে হাজার

হাজার কাঙাল-গরীবের অন্ন মিলিত, সাধু-ফকিরের সেবা-যত্ন হইত, দরবেশ-মুসাফিরের আশ্রয় মিলিত। নোয়াজেস্ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া মোতিঝিলের নবাব-ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিলের নীল জলরাশি, তাহার মাঝখানে আকাশ-ছোঁওয়া প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ঝিলের তীরে নানা ফুলে ভরা, লতাপাতা ঘেরা, ছোট ছোট বিলাস-কুঞ্জ। ভোর বেলাকার সোনার আলোয় ঝিলের জল ঝিল্‌মিল্ করিয়া বহিয়া যাইত, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীর গানে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিত।—নোয়াজেস্ আসিয়া মোতিঝিলে উঠিলেন।

মুর্শিদাবাদে আসিয়া নোয়াজেস্ দুই হাতে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গরীব-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, সকলেই নোয়াজেসের ভারি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ নোয়াজেসের উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারিল। সুযোগ বুঝিয়া রাজা রাজবল্লভও প্রভুকে সাহায্য করিবার জন্য ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া হাজির হইলেন। সকলেই বুঝিল, সিরাজদ্দৌলার আর আশা নাই, আলিবর্দীর শেষ নিশ্বাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াজেস্ মহম্মদই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর। আলিবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই নোয়াজেসের মৃত্যু হইল।

নোয়াজেসের কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। তাই ঘসেটী

বেগম সিরাজদ্দৌলার ভাই এক্‌রামদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। কিন্তু নোয়াজেসের মৃত্যুর পূর্বেই এক্‌রামদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং রাজবল্লভ এখন এক্‌রামদ্দৌলার একটি শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেই নবাবী করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নোয়াজেসের মত রাজবল্লভও দুইহাতে টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। টাকার লোভে নবাব-সরকারের স্বার্থপর কর্মচারীরা গোপনে গোপনে রাজা রাজবল্লভের পক্ষে চলিয়া পড়িল।

ইংরাজেরা তখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজা হন নাই, তাঁহারা তখন ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন মাত্র। দিনে দিনে তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দিকে দিকে বাড়িয়া উঠিতেছিল। রাজা রাজবল্লভ কাশিমবাজার কুঠির গোমস্তা ওয়াটস্-সাহেবকে হাত করিলেন। ওয়াটস্-সাহেবকে হাত করায় কলিকাতার ইংরাজ-দরবারও তাঁহার হাত হইয়া গেল। নবাব আলিবর্দীর অবস্থা তখন দিন দিন বেশী খারাপ হইয়া আসিতেছে। রাজবল্লভ অবসর বুঝিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"ঢাকার সমস্ত ধনরত্ন লইয়া, যত শীঘ্র পার সপরিবারে কলিকাতায় যাইয়া ইংরাজদের আশ্রয় লও।"

সহসা একদিন ঢাকার লোকে শুনিল, কৃষ্ণবল্লভ নৌকায় চড়িয়া সপরিবারে জগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরণীগুলি সাজিয়া আসিয়া তীরে ভিড়িল। কৃষ্ণবল্লভ

তাহাতে ঢাকার বিপুল ধনরত্ন বোঝাই করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভের ভাগ্যে তীর্থদর্শন ছিল না, তাই তাঁহার তরণীগুলি পুরীতে না যাইয়া হয়তো বা পথ ভুলিয়াই কলিকাতার বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল। কৃষ্ণবল্লভ নিরাপদে ইংরাজদের আশ্রয়ে উঠিলেন।

এ-দিকে ইউরোপে তখন ইংরাজদের সহিত ফরাসী-দের যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইংরাজদের মত ফরাসীরাও তখন আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ঐ-যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া পাছে ফরাসীরা ইংরাজদের আক্রমণ করেন, এই ভয়ে ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতায় ছুর্গ-প্রাকার গড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বারুদের গাদায় যেন আগুন পড়িল। সিরাজদ্দৌলা রাগিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। কেন না, ইউরোপে যাহা হয় হউক ; এ-দেশে ফরাসীরাও যেমন নবাবের প্রজা, ইংরাজেরাও সেইরূপ নবাবের প্রজা। ইংরাজে ফরাসীতে যদি কোন বিবাদ হয়, তবে নবাব তাহার বিচার করিবেন ; তাহার জন্য আবার ছুর্গ-প্রাকার কেন ? ইংরাজেরা যদি সত্যই বিপন্ন হন, তবে তাঁহারা নবাবের আশ্রয় চাহিলেন না কেন ? তাহা হইলে তো নবাব তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন, নিশ্চয়ই ইহাতে ইংরাজদের কুমতলব আছে ; তাহা না হইলে রাজদ্রোহী কৃষ্ণবল্লভকেই বা তাঁহারা আশ্রয় দিবেন কেন ?

এ-দিকে দিনে দিনে আলিবর্দীর পরমায়ু ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। শেষে একদিন তিনি সিরাজদ্দৌলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার চারিদিকে শত্রু। আমার মৃত্যু হইলে তোমার যে কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আমি যদি আর কিছুদিন বাঁচিতাম, তবে আমি নিজেই তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম; কিন্তু তাহা আর হইল না। এখন তুমি সতর্ক হও, মদ খাওয়া ছাড়িয়া সচ্চরিত্র হও।"

সিরাজদ্দৌলা আলিবর্দীর মৃত্যুশয্যা ছুঁইয়া শপথ করিলেন যে, আর কখনও তিনি মদ স্পর্শ করিবেন না। সেই দিন হইতে তিনি চিরদিনের মত মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। আলিবর্দীর চোখে মুখে একটু শান্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার শেষ নিশ্বাস অনন্ত বাতাসে মিশিয়া গেল।

ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে খোশ্‌বাগ নামক স্থানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের শেষ-শয্যা রচনা করা হইল। সিরাজদ্দৌলা তাঁহার বড় আদরের মাতামহকে চিরদিনের মত কবরের তলে রাখিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের মত প্রাসাদে ফিরিলেন।

সমস্ত মুর্শিদাবাদ জুড়িয়া তুমুল হাহাকার উঠিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। সিরাজদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। কেহ কোন শক্রতা করিতে সাহস করিলেন না, কেহ কোন বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন না। ষড়যন্ত্রকারীরা যে যেখানে ছিলেন সব চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সিরাজদ্দৌলার বুকের আগুন কিন্তু নিবিল না। রাত্রিদিন কেবল মাতামহের জন্য তাঁহার বুকের ভিতর হু-হু করিয়া জ্বলিয়া যাইত। তিনি অবসর পাইলেই বৃদ্ধ আলিবর্দীর স্নেহকোমল পাণ্ডুর মুখখানি কেবলই তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিত। আজ আর তাঁহাকে শাসন করিবার কেহ নাই, উপদেশ দিবার কেহ নাই। চারিদিক ঘিরিয়া কেবল শত্রু আর শত্রু। সিরাজদ্দৌলা শোক করিবারও অবসর পাইলেন না।

নূতন নবাব রাজকার্যে মন দিলেন। তখন তাঁহার চারিদিকে বহু শত্রু। কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতক। কেবল মোহনলাল আর মীরমদন ছিলেন যেমনি বিশ্বাসী তেমনি প্রভুভক্ত। মোহনলাল ছিলেন হিন্দু, আর মীরমদন ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই বাঙালী। এই বাংলা ছিল তাঁহাদের জন্মভূমি, এই বাংলারই ফলে-জলে-শস্যে তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন। আবার এই বাংলাতেই তাঁহারা তাঁহাদের বীরত্ব আর

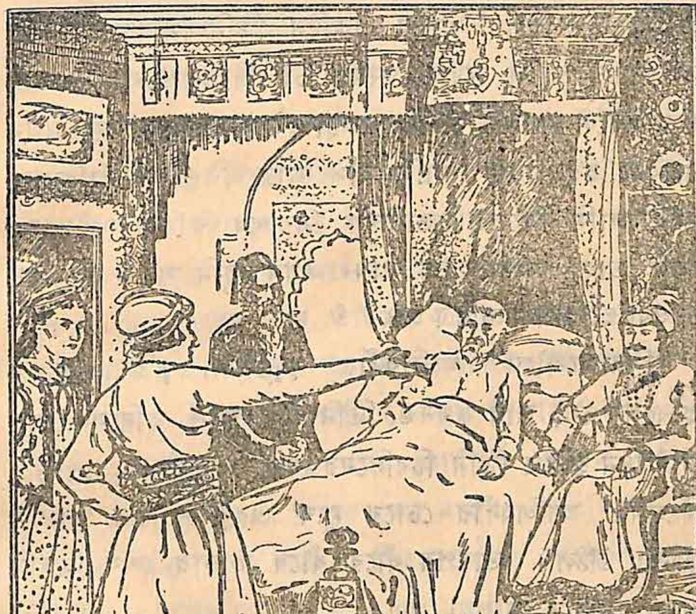
সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন, তাঁহার চারিদিক বেড়িয়া সর্বনাশের আগুন ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধ-নবাব আলিবর্দী খাঁ তখন মৃত্যু-শয্যায়। সিরাজের চোখে ঘুম নাই, মুখে অন্ন নাই; দিনরাত তিনি সমানে বসিয়া মুমূর্ষু মাতামহের সেবা করিতেছেন; কাজেই সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও তখন তিনি কিছু করিতে পারিলেন না। দেশ অরক্ষিত, জমিদারগণ অসন্তুষ্ট, কর্মচারীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এরূপ অবস্থাতেও সিরাজদ্দৌলা মুমূর্ষু মাতামহের পার্শ্ব ছাড়িয়া নড়িতে পারিলেন না।

একদিন মোহনলাল আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সিরাজদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি মোহনলাল?"

মোহনলাল বলিলেন, "আপনি আদেশ দিলে আমি ইংরাজদের দুর্গ-প্রাকার ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া কৃষ্ণবল্লভকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে পারি।"

আনন্দে সিরাজদ্দৌলার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই মুমূর্ষু আলিবর্দীর দিকে দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার মুখ আবার বিষণ্ণ হইয়া গেল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "মোহনলাল, তোমার প্রভুভক্তির তুলনা নাই। কিন্তু মাতামহের মৃত্যুকালে আমি আর কোন অশান্তির কোলাহল তুলিতে চাই না।"

মোহনলাল কুর্ণিশ করিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।



প্রভুভক্তির গৌরব-নিশান উড়াইয়া চিরদিনের মত অমর হইয়া রহিয়াছেন।

মোহনলাল সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি পরমা সুন্দরী বোন ছিলেন। তাঁহার দুধ-আলতা গায়ের রঙ্, মেঘবরণ কেশের ভার, মুখখানি যেন ঠিক একটি সকালবেলাকার সদ্যফোটা গোলাপ ফুল। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই নবাব-সরকারে মোহনলালের উন্নতি আরম্ভ হইল। মোহনলালও নিজের বুদ্ধিবলে ও কর্ম-কুশলতায় দিন দিন সিরাজদ্দৌলার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে অন্যতম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়া মহারাজ উপাধি লাভ করিলেন। পরে সিরাজদ্দৌলা যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন, তখন মোহনলালকে তিনি করিলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী—আর পাঁচহাজারী মন্সবদার।

রাজা রাজবল্লভের সহিত ইংরাজেরা যে ষড়যন্ত্র করিতে-ছিলেন তাহা সিরাজদ্দৌলা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নবাব হইয়াই একদিন তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মোহন-লালকে লইয়া মন্ত্রণা-ঘরে ঢুকিলেন। দুইজনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্রণা করিলেন। শেষে ঠিক হইল, ইংরাজদিগকে প্রথমে দমন করিতে হইবে।—এ-দিকে সান্ত্রী-পাহারা সব তটস্থ, কখন কি আদেশ হয়। তাঁহারা দুইজনে বাহির

হইলেন। নবাবের মুখ গম্ভীর, মোহনলালের চক্ষে আগুন। সিরাজদ্দৌলা কাহাকেও কিছু বলিলেন না, শুধু দূত পাঠাইয়া কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্-সাহেবকে ডাকাইয়া আনিলেন।

ওয়াটস্-সাহেব আসিয়া রীতিমত কুর্ণিশ করিয়া দরবারে দাঁড়াইলেন। সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "দেখ, তোমাদের ব্যবহারে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। শুনিলাম, তোমরা আমার হুকুম না লইয়াই কলিকাতার নিকটে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছ, কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়াছ। আমি তোমাদিগকে বণিক বলিয়াই জানি। যদি বণিকের মত শান্তভাবে থাক, তবে আমি তোমাদিগকে সাদরে আশ্রয় দিব। কিন্তু মনে রাখিও—আমিই এ-দেশের নবাব। যদি দুর্গ-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব কর, কিংবা কৃষ্ণবল্লভকে বন্দী করিয়া পাঠাইতে এতটুকু ইতস্ততঃ কর, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।"

ওয়াটস্-সাহেব আর কি বলিবেন? তিনি ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। শুধু বার দুই কুর্ণিশ করিয়া, চক্ষু কপালে তুলিয়া ঢোক গিলিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আর-কিছু না বলিয়া বিদায় দিলেন। ওয়াটস্-সাহেব কুঠিতে ফিরিয়া সকল কথাই কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন। কলিকাতার ইংরাজেরা কিন্তু সে-সকল কথায় মোটেই কান দিলেন না।

সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন, তাঁহার মুখের কথায় কোন ফল

হইল না। তখন তিনি কলিকাতায় একজন রাজদূত পাঠাইবার আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে খোজা বাজিদ নামে একজন আরমানী বণিক লবণের ব্যবসায় করিয়া দেশের মধ্যে খুব ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাব-দরবারেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকেই দূতরূপে কলিকাতার ইংরাজদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খোজা বাজিদও চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। যথাসময়ে তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া ইংরাজ-দরবারে একে একে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু কেহই সে-কথা গ্রাহ্য করিলেন না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কলিকাতার ইংরাজগণ খোজা বাজিদকে অপমান করিয়া নগর হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

খবর সিরাজদ্দৌলার কানে পৌঁছিল। সিরাজ মনে মনে ইংরাজদের উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া আর একজন দূত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

মোহনলাল বলিলেন, "জাঁহাপনা, যাহারা খোজা বাজিদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের কাছে আর-কোন দূত পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, এবারেও তাহারা নিশ্চয় আমাদের দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে।"

মীরমদন বলিলেন, "জাঁহাপনার আদেশ পাইলে আমরা ইংরাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "না—বৃথা রক্তপাতে আমার ইচ্ছা নাই। উড়িষ্যার নায়েব রামরাম সিংহ একজন বুদ্ধিমান হিন্দু। এবার আমি তাঁহার উপর দূত পাঠাইবার ভার দিব বলিয়া মনে করিয়াছি।"

সে-সময়ে চতুর বুদ্ধিমান বলিয়া রামরাম সিংহের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মোহনলাল ভাবিলেন, আচ্ছা দেখা যাক, রামরাম সিংহ কতদূর কি করিতে পারেন।

যথাসময়ে রামরাম সিংহের উপর নবাবের আদেশ আসিল। রামরাম সিংহের একটি ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম নারায়ণ সিংহ। রামরাম সিংহ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া-পড়াইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

নারায়ণ সিংহ ভাবিলেন, যাহারা একবার নবাবের দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহারা যদি তাঁহাকে নবাবের দূত বলিয়া জানিতে পারে তাহা হইলে হয় তো আর নগরেই ঢুকিতে দিবে না। তাই তিনি সামান্য একজন ফেরিওয়ালার বেশ ধরিয়া, ছোট একখানি ডিঙিতে চাপিয়া, নবাবের পত্র লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

যথাসময়ে নারায়ণ সিংহ কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। নিরাপদে যাইয়া তিনি উমিচাঁদের গৃহে আশ্রয় লইলেন। উমিচাঁদ ছিলেন একজন হিন্দু বণিক। তাঁহার রাজার মত প্রকাণ্ড পুরী, নানা-ফুলেভরা বাগান, সান্ত্রী-পাহারা-ঘেরা প্রকাণ্ড ফটক।

উমিচাঁদের ধন-ঐশ্বর্য দেখিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে একজন রাজা-মহারাজা বলিয়া মনে করিতেন। উমিচাঁদ নবাব-দরবারেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তখনকার দিনে ইংরাজেরা কোনও বিপদে পড়িলে প্রায়ই উমিচাঁদের কাছে ছুটিয়া আসিতেন, তাঁহার শরণ লইতেন। উমিচাঁদও নবাব-দরবারে বলিয়া-কহিয়া ইংরাজদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেন।

পরদিন নারায়ণ সিংহ উমিচাঁদের সঙ্গে ইংরাজ-দরবারে যাইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু এবারেও তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।—সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলে কি হইবে? ইংরাজদের তখন আশা ছিল যে, রাজবল্লভ শীঘ্রই সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া ঘসেটী বেগমের পোষ্যপুত্রটিকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেই নবাবী করিবেন। সেই ভরসাতেই ইংরাজেরা বারবার নবাবের দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

সিরাজদ্দৌলা সবই বুঝিতে পারিলেন।

মোহনলাল বলিলেন, "মোতিঝিলের চক্রান্ত সর্বপ্রথমে দমন করিতে হইবে।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "ঠিক কথা মোহনলাল, এখনি আমার মাসীমাকে আনিবার জন্য মোতিঝিলে তাঞ্জাম পাঠাও, আর তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য একদল ফৌজ।"

রাজবল্লভ শুনিলেন যে, ঘসেটী-বিবিকে লইয়া যাইবার

জন্য সিরাজদ্দৌলা মোতিঝিলের দিকে একদল ফৌজ পাঠাইয়াছেন। শুনিয়াই তিনিও অমনি সৈন্য-সামন্ত সাজাইয়া মোতিঝিলের সদরদরজা রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

খবর পাইয়া সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভকে নবাব-দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবাবের সে-আদেশ অমান্য করিতে রাজবল্লভের আর সাহসে কুলাইল না, কাজেই বিনা রক্তপাতে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। ঘসেটী-বিবি তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লইয়া, পোষ্যপুত্রটিকে সঙ্গে করিয়া, নবাব সিরাজ-দ্দৌলার অন্তঃপুরে আসিয়া উঠিলেন।

আলিবর্দীর মেজ জামাই সাইয়েদ্ আহম্মদ পূর্ণিয়ায় নবাবী করিতেন। তাঁহার যখন মৃত্যু হইল তখন তাঁহার পুত্র সওকতজঙ্গ হইলেন পূর্ণিয়ার নবাব। তিনি ছিলেন যেমনি ভীরু তেমনি কাপুরুষ। লেখাপড়া তিনি একবিন্দুও জানিতেন না। রাত্রিদিন কেবল মদ খাইয়া আর আমোদ করিয়া কাটাইতেন। রাজবল্লভ যখন দেখিলেন, তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তিনি সেনাপতি মীর জাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া আর এক নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া সওকতজঙ্গকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সওকতজঙ্গও ইহাতে সম্মত হইলেন। এতবড় নবাবীর লোভ কি সহজে ছাড়া যায়? সওকতজঙ্গ দিল্লীর দরবারে অজস্র টাকা ঢালিতে লাগিলেন। শীঘ্র

সেখান হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী করিবার জন্য তাঁহার নামে এক সনদ আসিল।

সিরাজদ্দৌলা সকলই শুনিলেন। শুনিয়াই তিনি আদেশ দিলেন, "সাজাও সৈন্য।"

বিদ্যুতের বেগে নবাবের সে-আদেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হাতীর পিঠে হাওদা উঠিল, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিল, দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড একদল নবাবী ফৌজ সাজিয়া দাঁড়াইল। নবাব পূর্ণিয়ার দিকে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

পূর্ণিয়ায় যাইবার সময় নবাব আরও একবার কলিকাতার ইংরাজগণকে তর্জন-গর্জন করিয়া পত্র লিখিলেন,—কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক-সাহেব পত্র পাইয়াই দুর্গ-প্রাচীর ভাঙিয়া না ফেলিলে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা নবাব সিরাজদ্দৌলা সশরীরে কলিকাতায় আসিয়া ড্রেক-সাহেবকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিবেন।

পূর্বে রাজা রাজবল্লভের ভরসায় ইংরাজেরা দুই-দুইবার দূতকে অপমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সে-ভরসা নাই। সেজন্য এবার নবাবের পত্র পাইয়া সকলের বুকের ভিতর ভয়ে দুর-দুর করিয়া উঠিল। ড্রেক তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইলেন, "সমস্তই মিথ্যা কথা। কে বলিল, আমরা দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছি? ফরাসীদিগের সহিত আবার আমাদের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে

বলিয়া কেবল আমরা নদীতীরের কামান পাতিবার স্থানগুলি মেরামত করাইয়াছি।"

নবাব তখন রাজমহলে ছাউনি ফেলিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে ড্রেক-সাহেবের পত্র আসিল। পত্র পড়িয়া নবাব একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন।—কী মিথ্যাবাদী! নবাবের চোখের তারা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, শিরার রক্তে বিদ্যুৎ ছুটিল। পাত্রমিত্রগণের মুখে কথাটি নাই। সবাই বুঝিলেন, এবার ইংরাজদের রক্ষা নাই। নবাব আদেশ দিলেন, "উঠাও ছাউনি।"

খট্‌খট্ খটাখট্ খট্—ছাউনির খোঁটায় ঘা পড়িল। দেখিতে দেখিতে আবার নবাবী ফৌজ ছাউনি উঠাইয়া মহাকলরব করিতে করিতে মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটিল।

॥ ৪ ॥

২৪ মে, সোমবার, অপরাহ্ণে নবাবের আদেশে জমাদার উমর বেগ তিন হাজার অশ্বারোহী লইয়া কাশিমবাজার আসিয়া শিবির ফেলিলেন। মাঝে মাঝে নবাবী ফৌজ এরূপভাবে আসিয়া কাশিমবাজারে শিবির ফেলিত, সুতরাং সেদিন কেহ আর সন্দেহ করিল না। পরদিন ভোর হইতে না হইতেই আরো দুই হাজার অশ্বারোহী এবং কতকগুলি বরকন্দাজ আসিয়া উমর বেগের সহিত মিলিত হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুইটি রণহস্তী হেলিতে দুলিতে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতেই ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। নবাবের দু-দুইজন সম্মানিত দূতকে তাঁহারা যে কেমন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন তাহা আজ তাঁহাদের মনে পড়িল। তাঁহারা বুঝিলেন, নবাব এবার নিশ্চয়ই তাহার প্রতিশোধ দিবেন।

কাশিমবাজার কুঠিতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কুঠিয়াল সাহেবগণ যে যেদিকে পারিলেন পলাইতে আরম্ভ করিলেন। ওয়াটস্-সাহেব চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। দুর্গে তখন কেবল ৩৫জন গোরা, ৩৫জন কালা সিপাহী, আর জনকয়েক লোক-লস্কর ছিল। অগত্যা তাহারাই তুড়ি ভেরি বাজাইয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, কোমরে কোমরবন্ধ আঁটিয়া, বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া, ফটক রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নবাবী পল্টন দুর্গ আক্রমণ করিল না।

ওয়াটস্-সাহেবের ধাঁধা লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না ব্যাপার কি। সোম, মঙ্গল, বুধ গেল—বৃহস্পতিও যায়-যায়। তথাপি নবাবী ফৌজ কিছু করিল না, যেমন বসিয়া ছিল তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওয়াটস্-সাহেবের উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ডাক্তার ফোর্থ-সাহেবকে উমর বেগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ডাক্তার ফোর্থ যখন উমর বেগের নিকট হইতে দুর্গে ফিরিলেন তখন সকলে যাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ফোর্থ বলিলেন, "ওয়াটস্-সাহেবকে নবাব-দরবারে হাজির হইয়া একখানি মুচলেকা লিখিয়া দিতে হইবে। সহজে তিনি যাইতে সম্মত না হইলে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। সেজন্যই এত সৈন্য-সামন্ত সমবেত করা হইয়াছে।"

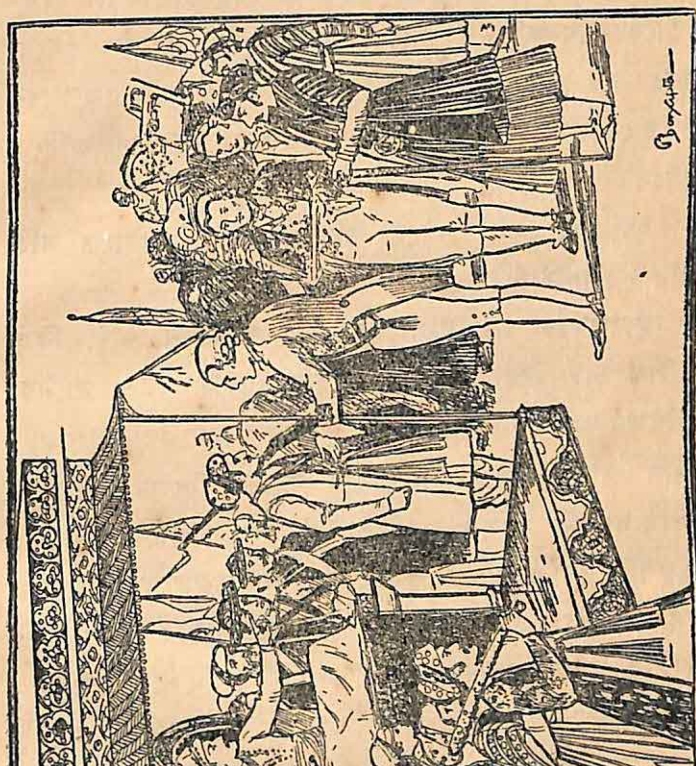
শুনিয়া ওয়াটস্-সাহেবের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি উমর বেগের কথায় বিশ্বাস করিয়া নবাব-দরবারে যাইতে সাহস করিলেন না। তখন আবার সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শ করিয়া নবাব-দরবারে এক আবেদনপত্র পাঠান হইল। তাহাতে লেখা হইল যে, নবাব-বাহাদুরের অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে পারিলে, তিনি যাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাই করিবেন। যথাকালে নবাব-দরবার হইতে উত্তর আসিল,

'কলিকাতার দুর্গপ্রাকার ভাঙিয়া ফেল।—নবাবের তাহাই একমাত্র অভিপ্রায়।'

নবাবের অভিপ্রায় শুনিয়া ওয়াটস্-সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইবেন না। শেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা রাজবল্লভের শরণ লইলেন। রাজবল্লভ বলিলেন, "ওয়াটস্-সাহেব যদি হাতে রুমাল বাঁধিয়া হীনবেশে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট উপস্থিত হন, তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।" ওয়াটস্-সাহেব আর কি করিবেন, তাহাতেই রাজী হইলেন।

ওয়াটস্-সাহেব দরবারে পৌঁছিতেই সিরাজদ্দৌলা গর্জন করিয়া উঠিলেন। ওয়াটস্-সাহেব ভয়ে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবিলেন, আর রক্ষা নাই, ওয়াটস্-সাহেবকে এইবার হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারা হইবে। সিরাজদ্দৌলা কিন্তু তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি ওয়াটস্-সাহেবকে মুচলেকায় সহি করিতে বলিলেন।

মুচলেকায় লেখা হইল যে, কলিকাতার দুর্গপ্রাকার ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী যাহারা কলিকাতায় লুকাইয়া আছে তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে হইবে, বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে বাদশাহী সনদ পাইয়াছেন তাহার দোহাই



দিয়া অন্য লোকেও বিনাশুল্কে বাণিজ্য চালাইয়া রাজ-কোষের যে-ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইবে, আর কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল-সাহেব প্রজাগণের উপর যে-অত্যাচার করিয়া থাকেন তাহা নিবারণ করিতে হইবে।

মুচলেকা লেখা হইলে ওয়াটস্‌-সাহেব তাহাতে সহি করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

মুচলেকায় ওয়াটস্‌-সাহেব সহি করিলেন বটে, কিন্তু কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাহার একটি সর্তও মানিয়া চলিলেন না। ইংরাজের স্পর্ধা সিরাজের আর সহ্য হইল না; তিনি আবার সৈন্য সাজাইবার আদেশ দিলেন। বিরাট নবাব-বাহিনী আবার সাজিয়া দাঁড়াইল। পাছে সিরাজের অনুপস্থিতির সুযোগে কুচক্রিগণ সওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সর্বনাশ করে, এই ভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি তাঁহার সন্দেহ ছিল তাঁহাদের সকলকেই তিনি সঙ্গে লইলেন। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীর জাফর, মানিকচাঁদ প্রভৃতি কাহাকেও রাজধানীতে রাখিয়া গেলেন না। কেবল মোহন-লাল রাজধানী রক্ষার জন্য রহিলেন।

১৮ জুন প্রাতে কলিকাতার উত্তরে নবাবী কামান গর্জন করিয়া উঠিল—গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্—ম্—ম্—ম্। ইংরাজের বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি তাঁহারা সাহস করিয়া কামানে আগুন দিলেন। অমনি ইংরাজের কামান গর্জিয়া

উঠিল—হুড়ুম—হুড়ুম—দ্রূম্—ম্—ম্—ম্। সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত গোলা ছুটিল। নবাবী ফৌজ একপাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন সকাল হইতেই উত্তরে নবাবী কামান নীরব হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক হইতে হু-হু করিয়া জ্বলন্ত গোলা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাড়াতাড়ি আসিয়া তোপমঞ্চে উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সহসা তিনদিক হইতে নবাবী ফৌজ ইংরাজের তিনটি তোপমঞ্চই আক্রমণ করিল। আর নগর রক্ষার উপায় রহিল না। ইংরাজেরা তোপমঞ্চ ছাড়িয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। নবাব-সৈন্য ইংরাজের তোপমঞ্চ দখল করিয়া ইংরাজের কামানেই ইংরাজদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিল। নবাবী-ফৌজের বীরপদভরে সমস্ত কলিকাতা টলমল করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজের দুর্গে তুমুল হাহাকার উঠিল।

দেখিতে দেখিতে পূবের সূর্য পশ্চিমে ডুবিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল।

দুর্গমূলে গঙ্গার ঘাটে কতকগুলি ছোট ছোট ডিঙি ও একখানি জাহাজ বাঁধা ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেই ইংরাজেরা অনেকেই চুপি চুপি দুর্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জাহাজে চাপিয়া পলায়ন করিলেন।

২০ জুন সহস্র সহস্র নবাব-সেনা দুর্গমূলে আসিয়া সমবেত

হইতে আরম্ভ করিল। দুর্গমধ্যে মহা-কলরব, মহা-ছুটাছুটি আরম্ভ হইল। সহসা কে পশ্চিম দিকের দুর্গদ্বার খুলিয়া ফেলিল। দ্বার খোলা পাইয়া প্রবল জলস্রোতের মত নবাব-সেনা হু-হু করিয়া দুর্গমধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গের সকলেই বন্দী হইল। ইংরাজ-দুর্গের উন্নত প্রাকারে সিরাজদ্দৌলার বিজয় পতাকা সগৌরবে উড়াইয়া দেওয়া হইল।

বিকাল পাঁচটার সময় পাত্রমিত্রগণকে সঙ্গে করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতার দুর্গে পদার্পণ করিলেন। দুর্গ জয় হইল। সমস্ত কলিকাতা নবাবের অধিকারে আসিল। সিরাজদ্দৌলা কলিকাতার নাম পরিবর্তন করিয়া আলিনগর নাম রাখিলেন। আজিও আলিপুর নামে তাহার কিছু পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

নবাব আর বেশী দিন কলিকাতায় রহিলেন না। মহারাজ মানিকচাঁদের হাতে কলিকাতার শাসনভার দিয়া ২ জুলাই সৈন্য-সামন্ত লইয়া নবাব রাজধানীর দিকে রওনা হইলেন।

এদিকে মোহনলাল শুনিলেন, নবাব রণজয় করিয়া মহাসমারোহে রাজধানীতে ফিরিতেছেন। তিনি সমস্ত মুর্শিদাবাদ জুড়িয়া বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়া, ফলে-ফুলে-পাতায় নগর-তোরণ সাজাইয়া নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

॥ ৫ ॥

১১ জুলাই নবাব সিরাজদ্দৌলা সৈন্য-সামন্ত লইয়া সগৌরবে রাজধানীতে ফিরিলেন। সমস্ত মুর্শিদাবাদে মহাসমারোহে বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। দিকে দিকে আনন্দ-কোলাহল, ঘরে ঘরে নাচ-গান। ঘন ঘন কামান গর্জনে সমস্ত শহর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সাতদিন সাতরাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিল।

উৎসব শেষ হইলে নবাব সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্যে মন দিবার আয়োজন করিলেন। এমন সময়ে সহসা সংবাদ আসিল, পূর্ণিয়ার নবাব সওকতজঙ্গ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। শুধু তাই নয়, দিল্লীর বাদ্‌শাও বহুদিন রাজকর না পাইয়া তাঁহার পুত্রকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন। শাহাজাদাও বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন—সর্বনাশ! তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মোহনলালকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন —উপায় কি?—কি করা যায়? তাঁহারা দুইজনেই বুঝিয়াছিলেন যে, এ-সমস্তই তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে হইতেছে।

মোহনলাল বলিলেন, "জাঁহাপনা, শাহাজাদা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সওকতজঙ্গকে দমন করিতে হইবে। তাহা

না হইলে, যদি সওকতজঙ্গ আর শাহাজাদা একসঙ্গে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন, তবে সিংহাসন রক্ষা করা সুকঠিন হইবে।"

নবাব বলিলেন, "ঠিক কথা। কিন্তু সওকতজঙ্গ আমার আত্মীয়। বিনাযুদ্ধে যদি সে আমার বশ্যতা স্বীকার করে, তবে আর আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই।"

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে?"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "পূর্ণিয়া প্রদেশে বীরনগরে একজন ফৌজদার থাকিত। এখন সে-পদটি খালি রহিয়াছে। রাসবিহারী নামে একব্যক্তিকে আমি সেখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সওকতজঙ্গকে লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি সওকতজঙ্গ তাহাতে কোন আপত্তি না করে তবে বুঝিব যে, সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। তাহা হইলে আর আমাদের যুদ্ধ করিবার দরকার হইবে না।"

মোহনলাল বুঝিলেন—এ-কৌশল মন্দ নয়। তিনি বলিলেন, "তবে তাহাই হোক।"

রাসবিহারী নবাবের পত্র লইয়া পূর্ণিয়া গেলেন। সওকতজঙ্গ নবাবের পত্র পড়িয়া রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হইলেন। তিনি রাসবিহারীকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তারপর সিরাজদ্দৌলাকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি বাদশাহী সনদ পাইয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

নবাব হইয়াছি। তুমি আমার পরম আত্মীয়, তাই তোমার প্রাণবধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বরং তুমি যাহাতে খাইতে পরিতে পাও, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব; অতএব যত শীঘ্র পার প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাও, আমি বাধা দিব না। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের একটি পয়সাতেও হাত দিও না। যত শীঘ্র পার উত্তর পাঠাইও। আর সময় নাই। আমার ঘোড়া তৈরী। আমিও রেকাবে পা তুলিয়াছি। তোমার উত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।"

পত্র পড়িয়া সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন, সোজা কথায় কাজ হাঁসিল হইবে না। তিনি তখনই দরবারে বসিলেন। দেওয়ান রাজবল্লভ, সিপাহশালার মীর জাফর, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ, সেনাপতি মীর মদন, প্রধান মন্ত্রী মোহনলাল প্রভৃতি সভা আলো করিয়া বসিলেন। মাঝখানে মণি-মাণিক্য-মোড়া প্রকাণ্ড সোনার মস্‌নদে হীরা-মোতির ঝালর-দেওয়া রাজছত্রের তলে স্বয়ং নবাব সিরাজদ্দৌলা। সভা আরম্ভ হইল। সওকতজঙ্গের উদ্ধত পত্রের কথা তিনি সকলকে বলিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, ইহার পর আর কেহ যুদ্ধের কথায় বাধা দিবেন না। কিন্তু তাহা হইল না। কথা উঠিতেই কুচক্রিদল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন। জগৎশেঠ তো সকলের আগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দিল্লীর বাদশাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হর্তাকর্তা। তাঁহারই সনন্দ-বলে বাংলার নবাব শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। সিরাজ-

দ্দৌলার সনন্দ নাই, কিন্তু সওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। অতএব কে রাজা আর কে প্রজা এখন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।”

জগৎশেঠের কথায় সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখনই তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। মীর জাফর অমনি সকলের সাম্‌নেই তলোয়ার ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর তিনি কখনও সিরাজদ্দৌলার জন্য তলোয়ার ধরিবেন না। সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন, তাঁহার রাজধানীতেই বুঝিবা বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি জগৎশেঠকে ছাড়িয়া দিলেন।

সিরাজদ্দৌলা আর তাঁহার কর্মচারিগণের কথায় কান দিলেন না। নিজেই ঠিক করিলেন, পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিন দিক দিয়া তিনি সওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবেন। উত্তরে আকাশ-ছোঁওয়া হিমালয়—সেদিকে আক্রমণেরও সুবিধা নাই, পলায়নেরও সুবিধা নাই। নবাব তাঁহার সৈন্য-দলকে তিন ভাগে ভাগ করিলেন। এক ভাগ নিজে লইয়া রাজমহলের পথে ধাবিত হইলেন। এই ভাগে মীর জাফর খাঁকে সেনাপতি করিয়া তাঁহাকে নিজের চোখে চোখে রাখিলেন। এক ভাগকে রাজা রামনারায়ণের নেতৃত্বে পাটনা হইতে সওকতজঙ্গকে পশ্চিম দিকে আক্রমণ করিয়া পরে শাহাজাদার গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। আর

এক ভাগকে মহারাজ মোহনলালের নায়কতায় জলঙ্গী বহিয়া, পদ্মা পার হইয়া পূর্ণিয়া আক্রমণের ভার দিলেন। তিন দিক হইতে তিন দল সৈন্য ঘোড়ার খুরে ধূলা উড়াইয়া, আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিল।

এই খবর পূর্ণিয়ায় পৌঁছিল। সওকতজঙ্গও অমনি তাঁহার সৈন্যসামন্ত সাজাইয়া, তুরী ভেরী বাজাইয়া, মহাসমারোহ করিয়া নারায়ণগঞ্জে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। সওকতজঙ্গ যেখানে সৈন্য সাজাইলেন তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড জলাভূমি। সেই জলাভূমি পার হইয়া সওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার মত একটি সরু পথ। সেই পথের মুখে কয়েকটি কামান পাতিয়া সামান্য কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য রাখিলে শত্রু-সৈন্যেরা আর সে-পথে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা করা হইল না।

সওকতজঙ্গ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন মোহনলাল আর মীর জাফর সসৈন্যে মার মার করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাদের বাধা দিল না। তাঁহারা একেবারে জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। মোহনলাল সেখান হইতে তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, “দাগো কামান।”

ভীম কলরবে মোহনলালের কামানশ্রেণী গর্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু অধিকাংশ গোলাই অর্ধপথে জলাভূমির জলে পড়িয়া নিবিয়া যাইতে লাগিল। কেবল যে দুই-একটি

গোলা যাইয়া সওকতজঙ্গের সেনানিবাসে পড়িল তাহাতেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সওকতজঙ্গ হতবুদ্ধি হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া সওকতজঙ্গের একজন বুড়া সেনাপতি আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, এ কেমন যুদ্ধ? আমরা দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্কের অধীনে অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু এমন যুদ্ধ তো কখনও দেখি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে। যে যে-দিকে পারিতেছে সে সেই দিকে পলাইতেছে। এমন করিয়া আর কতক্ষণ শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিবেন? গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে সম্মুখে সাজাইয়া, তাহার পরে অশ্বারোহীদিগকে রাখিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ দিন।"

"কি, এতবড় স্পর্ধা যে আমাকে উপদেশ দেয়!"—সওকতজঙ্গ রাগিয়া আগুন হইলেন। তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন, "যাও, যাও—আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে হইবে না। নিজাম-উল্-মুল্ক্ গাধা—তাই সে তোমাদের মত লোকের কথা শুনিয়া যুদ্ধ করিত। আমি এই বয়সে এমন তিনশ' লড়াই করিয়াছি, আর আজ তুমি আসিয়াছ আমাকে উপদেশ দিতে!"

বুড়া সেনাপতি আর কি করিবেন—তাড়াতাড়ি সেলাম ঠুকিয়া সরিয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামে একজন বাঙালী হিন্দু সেনাপতি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না।

তাড়াতাড়ি সম্মুখের পদাতিক সৈন্যগণকে পিছনে সরাইয়া দিয়া নিজেই কামান লইয়া অগ্রসর হইলেন। সহসা শ্যামসুন্দরের কামান গর্জন করিয়া উঠিল—গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্-ম্-ম্-ম্।

ওপারে মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিলেন।—এ আবার কাহার কামান গর্জন!

শ্যামসুন্দরের বীরত্ব দেখিয়া সওকতজঙ্গের ভারি স্ফূর্তি হইল। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন—"অগ্রসর হইয়া আক্রমণ কর।"

সেনাপতিগণ বলিলেন, "জনাব, এখন অগ্রসর হইলেই দুই দলের গোলার ঘায়ে আমাদিগকে মাঝখানে দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।"

সওকতজঙ্গ রাগিয়া উঠিলেন। তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, হিন্দু শ্যামসুন্দর কেমন লড়াই করিতেছে—সে মরিল না, আর মুসলমান বীরপুরুষ তোমরা, লড়াই করিলেই মরিয়া যাইবে!—যত সব কাপুরুষ!"

সেনাপতিগণ সে-তিরস্কার সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা পলকমধ্যে অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুত যুদ্ধে চলিলেন।

সওকতজঙ্গ ভাবিলেন, আর কি, সেনাপতিরা যেরূপ তেজে অগ্রসর হইলেন তাহাতে যুদ্ধ তো জয় হইবেই। তবে আর মিছামিছি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিবার দরকার কি?

—তিনি শিবিরে ফিরিয়া নাচুনীদের ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "নাচ, গাও, স্ফূর্তি কর।"

নাচ-গান আরম্ভ হইল। সওকতজঙ্গ মদ খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

এদিকে সওকতজঙ্গের অশ্বারোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইতেই মোহনলাল ভীমবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শ্যামসুন্দর আর মোহনলালের গোলার ঘায়ে মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলাভূমির জল লালে লাল হইয়া গেল। বাকী সৈন্যদল যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। অন্যান্য সেনাপতিরা দেখিলেন, অবস্থা বড় খারাপ; তাই তাঁহারা সৈন্যগণকে উৎসাহ দিবার জন্য সওকতজঙ্গকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া শিবিরে গিয়াছেন। সেনাপতিরা সেখানে গিয়া দেখিলেন, নাচ-গান চলিতেছে—আর সওকতজঙ্গ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহারা সেই অবস্থাতেই সওকতজঙ্গকে বাহিরে আনিয়া হাতীর পিঠের হাওদায় বসাইয়া দিলেন। সেনাপতিরা ভাবিয়াছিলেন, সৈন্যগণ হয় তো সওকতজঙ্গকে দেখিয়া আবার দ্বিগুণ তেজে লড়াই করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সৈন্যেরা সওকতজঙ্গকে দেখিয়া আর উৎসাহিত হইল না, যে যেমন পলাইতেছিল তেমনি পলাইতে লাগিল।

হঠাৎ মোহনলালের একটি গোলা আসিয়া সওকতজঙ্গের মাথার উপরে ফাটিয়া পড়িল। সওকতজঙ্গ হাওদার উপর সেই যে লুটাইয়া পড়িলেন আর উঠিলেন না। সব ফুরাইল।

মোহনলাল বীরদর্পে রণজয় করিয়া পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন। সিরাজদ্দৌলা পূর্ণিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিলেন। তারপর দুইজনে দেখা হইল। সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "মোহনলাল, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই পূর্ণিয়ার শাসনভার পুরস্কারস্বরূপ তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম।"

মোহনলাল সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ ও তলোয়ার স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনার জন্যই আমার এ-তলোয়ার চির-উৎসর্গীকৃত রহিল।"

॥ ৬ ॥

এদিকে নবাব যখন পূর্ণিয়ার যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, ইংরাজেরা আবার তখন নবাবের কর্মচারিগণের সহিত গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের ইংরাজ-দরবার তখন কলিকাতার ইংরাজগণকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকদল সৈন্য সঙ্গে দিয়া কর্ণেল ক্লাইব ও কর্ণেল ওয়াট্‌সন নামক দুইজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। নবাবের সহিত যুদ্ধ ও কলহ করিয়া ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন বড়ই ক্ষতি হইতেছিল। সুতরাং বাংলাদেশের ইংরাজেরা সেই সময় নবাবের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নবাবেরও ইংরাজদের সহিত অনর্থক বিবাদ করার ইচ্ছা কোনদিনই ছিল না। তাই সন্ধি করিতে তাঁহারও কোন অমত ছিল না। কিন্তু ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন আসিয়াই যত গোলযোগ বাধাইলেন।

ক্লাইব আর ওয়াট্‌সন আসিয়া দেখিলেন, কলিকাতা একরূপ অরক্ষিত। দুর্গ রক্ষার জন্য যে-সব কামান সাজান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই অকর্মণ্য। কলিকাতা রক্ষার প্রতি মানিকচাঁদেরও সেরূপ নজর নাই। তাঁহারা কলিকাতা আক্রমণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মানিকচাঁদের নিকট সে-খবর পৌঁছিল। তিনি বুঝিলেন, বিনাযুদ্ধে কলিকাতা ইংরাজের হাতে ছাড়িয়া দিলে নবাবের কাছে

তাঁহার রক্ষা থাকিবে না। তাই তিনিও ঢাল-তলোয়ার বাঁধিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন।

কলিকাতার কিছুদূরে বজবজের নিকটে উভয় দলে দেখা হইল। কিন্তু যুদ্ধ হইল না। ইংরাজেরা দুই-চারিটি গোলা ছুঁড়িতেই মানিকচাঁদ বজবজ ছাড়িয়া, কলিকাতা ফেলিয়া সদলবলে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ক্লাইব বিনাবাধায় কলিকাতা অধিকার করিলেন। কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরাজেরা হুগলী লুট করিলেন। তাঁহারা হঠাৎ কলিকাতা জয় ও হুগলী লুট করায় নবাব যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন।

নবাবের বিশ্রাম করিবার অবসর মিলিল না। আবার তিনি ফৌজ সাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা বীরপুরুষ হইলেও বিশেষ শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়াও ওয়াট্‌সন-সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা হুগলী লুটপাট করিয়াছ—আমার প্রজাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ—ইহা নিশ্চয়ই সওদাগরের উপযুক্ত কাজ হয় নাই। তোমাদের ব্যবহারে আমাকে বাধ্য হইয়া মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া হুগলীর নিকটে আসিতে হইয়াছে। আমি সসৈন্যে নদী পার হইতেছি; আমার সেনাদলের এক ভাগ তোমাদের শিবিরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কিন্তু এখনও যদি তোমরা শান্তিপ্রিয় বণিকের মত আমার রাজ্যে বাণিজ্য করিতে চাও এবং আর যদি কখনও শান্তিভঙ্গ না কর, তাহা

হইলে এখনও আমি তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।”

বিলাত হইতে সে-সময়ে আবার খবর আসিয়াছিল যে, ইউরোপে পুনরায় ইংরাজে ও ফরাসীতে লড়াই বাধিয়াছে তখনকার দিনে এদেশে ফরাসীরা বীরত্বে ও সাহসে ইংরাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই ইংরাজেরা ফরাসীর ভয়ে তাড়াতাড়ি নবাবের সহিত সন্ধি করিবায় জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সিরাজদ্দৌলা কলিকাতায় আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। সন্ধির দিন স্থির হইয়া গেল।

ষড়যন্ত্রকারিগণ দেখিলেন, সব বুঝি ফাঁসিয়া যায়! রাজবল্লভের আর আশা-ভরসা নাই, সওকতজঙ্গও আর বাঁচিয়া নাই—এখন একমাত্র ভরসা ইংরাজদের উপর। সেই ইংরাজেরাই যদি এখন নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া বন্ধুত্ব করে, তবে আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকা যায়? তাই ষড়যন্ত্রকারীরা যাহাতে সন্ধি না হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ইংরাজদের সহিত সিরাজদ্দৌলার সন্ধি হইয়া গেল। সন্ধি শেষ করিয়া নবাব রাজধানীর দিকে ফিরিলেন।

অগ্রদ্বীপে পোঁছিয়াই নবাব খবর পাইলেন যে, ইংরাজেরা চন্দননগরের ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। খবর পাইয়াই তিনি ওয়াট্‌সন-সাহেবকে

লিখিয়া পাঠাইলেন—"এই সেদিন তোমরা ঈশ্বরের নামে, যীশু খৃষ্টের নামে শপথ করিয়া সন্ধি করিয়াছ যে, আমার রাজ্যে আর কোনদিন শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে আবার ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিতে চাহিতেছ কেন? তোমরাও যেমন আমার আশ্রিত বণিক, ফরাসীরাও তেমনি আমার আশ্রিত বণিক। তোমরা যদি সন্ধি করিয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে আশ্রিত রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া আমাকে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে।"

শুধু পত্র লিখিয়াই নবাব নিশ্চিন্ত রহিলেন না। প্রজারক্ষার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলী, অগ্রদ্বীপ ও পলাশীতে সেনাসমাবেশ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন।

ইংরাজেরা কিন্তু নবাবের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, চন্দননগরের ফরাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া তাঁহারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিবেন। সব ঠিকঠাক করিয়া ইংরাজেরা মহারাজ নন্দকুমারকে অনেক টাকা ঘুষ দিলেন। ঘুষ খাইয়া মহারাজ নন্দকুমার ডঙ্কা বাজাইয়া, ছাউনি উঠাইয়া দূরে সরিয়া পড়িলেন। ক্লাইব সুযোগ দেখিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। ইংরাজে-ফরাসীতে ভয়ঙ্কর লড়াই হইল। ফরাসীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জিতিতে পারিলেন না। তাঁহারা পরাজিত হইয়া

মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন। নবাব তাঁহাদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয় দিলেন।

ইংরাজেরা তর্জন-গর্জন করিয়া নবাবকে পত্র লিখিলেন, 'এখনই পলায়িত ফরাসীগণকে বাঁধিয়া আমাদের নিকট পাঠান হোক।' নবাব কিন্তু আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ইংরাজেরা তখন সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি ইয়ার লতিফ খাঁ, মীর জাফর খাঁ, রায় দুর্লভ, মহারাজ মানিকচাঁদ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। দুই দলে গোপনে গোপনে এক সন্ধি হইল। ঠিক হইল যে, সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া মীর জাফরকে নবাব করা হইবে। আর মীর জাফর নবাব হইয়া সকলকে অনেক টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

সিরাজদ্দৌলা সে গুপ্ত সন্ধির কথা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, এখনই মীর জাফরকে বন্দী করা উচিত। কিন্তু মীর জাফরের প্রাসাদ সুরক্ষিত—সেখানে তাঁহার গোলাগুলি সৈন্য-সামন্তের অভাব নাই। কাজেই মীর জাফরকে বন্দী করিতে গেলে এখনই একটা হাঙ্গামা বাঁধিবে। অতএব তাহাতে কাজ নাই। তাহার চেয়ে বরং মীর জাফরকে নিজের দলে আনিবার চেষ্টা করা যাক। নবাব মীর জাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর জাফরের কিন্তু নবাবের নিকটে আসিতে সাহসে কুলাইল না—তিনি আসিলেন না। অগত্যা নবাব নিজেই তাঞ্জামে চাপিয়া মীর জাফরের বাড়ীর

সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন। মীর জাফর আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, নবাবকে তাঞ্জাম হইতে নামাইয়া, সসম্মানে ভিতরে আনিয়া বসাইলেন।

সিরাজদ্দৌলা মীর জাফরকে মিষ্টি-মিষ্টি অনেক তিরস্কার করিলেন। মীর জাফর কোন কথাই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন মীর জাফর মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ স্পর্শ করিয়া অন্নদাতা নবাবের পদতলে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন মুসলমানের সিংহাসন প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিব। ফিরিঙ্গীর সহায়তা আর কখনও করিব না।"

সিরাজদ্দৌলা খুশী হইয়া প্রাসাদে ফিরিলেন। তাঁহার আশা হইল, মীর জাফর যখন কোরাণ ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি আর কখনও ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিবেন না, তখন আর ইংরাজদের নিস্তার নাই। তিনি আদেশ দিলেন—"সাজাও বাহিনী।"

বিরাট বাহিনী সাজিয়া দাঁড়াইল। নবাব যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীর মদন, ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রেঁ আর নবাবের প্রধান মন্ত্রী পাঁচহাজারী মন্সবদার মহারাজ মোহনলাল। মনকরা ছাড়িয়া ভাগীরথী যেখানে ঘোড়ার

খুরের মত বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই তীরে পলাশীর প্রকাণ্ড ময়দানে নবাব ছাউনি ফেলিলেন।

এদিকে মীর জাফর নবাবের নিকটে কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজদিগকে চিঠিপত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর তাহা জানিতে পারিলেন না।

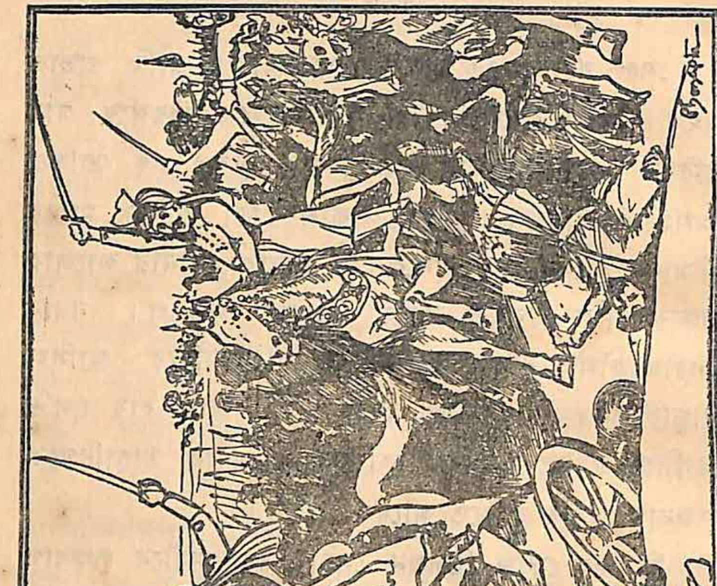
ইংরাজেরা পূর্বেই কাটোয়ার দুর্গ দখল করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা মীর জাফরের উপদেশে ধীরে ধীরে গঙ্গা পার হইয়া পলাশীতে আসিয়া উঠিলেন। পলাশীর একধারে তখন প্রকাণ্ড একটি আমবাগান ছিল। সেই আমবাগানে নাকি একলক্ষ আমগাছ ছিল। তাই লোকে তাহাকে বলিত লক্ষবাগ। ইংরাজেরা আসিয়া সেই লক্ষবাগের ধারে শিবির ফেলিলেন।

॥ ৭ ॥

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ, ২৩ জুন, বৃহস্পতিবার। রাত্রি প্রভাত হইল। গাছে গাছে পাখীরা ঘুম ভাঙিলে মধুরস্বরে গান ধরিল। ভোরবেলাকার স্নিগ্ধ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পূবের আকাশ রাঙা করিয়া মাঠের সীমায় সূর্যদেব দেখা দিলেন। তাঁহার সোনার আলোয় গঙ্গার জল ঝল্‌মল্‌ করিয়া বহিতে লাগিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা নমাজ শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীর জাফর, ইয়ার লতিফ আর রায় দুর্লভ আসিয়া নবাবকে কুর্ণিশ করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে লক্ষবাগ ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন।

তিন দল ফৌজ তিনজন সেনাপতির অধীনে লক্ষবাগ ঘেরাও করিতে চলিল। ক্লাইব দেখিলেন, বিরাট নবাবী পল্টন তাঁহাকে সদলবলে ঘিরিয়া মারিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, এই সৈন্যদল যদি তাঁহাকে ঘিরিয়া কামানে আগুন দেয়, তবে তাঁহার আর রক্ষা থাকিবে না। পরাজয় তো তাঁহার হইবেই, কিন্তু সেই পরাজয়ের কথা দেশে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার একজন সৈন্যও বাঁচিয়া থাকিবে কিনা সন্দেহ।

এদিকে বেলা ৮টার সময় নবাবের আদেশে মীর মদন তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া কামানে আগুন দিলেন। মহারাজ মোহনলাল তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মীর



মদনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্লাইবের কামানও গর্জিয়া উঠিল—গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্-ম্-ম্-ম্। সহসা পাখীর কণ্ঠের গান থামিল, দূরে গ্রামের পথিক চলিতে চলিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। কামানের ধোঁয়ায় সকালবেলাকার পরিষ্কার আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। ক্লাইব দেখিলেন, সর্বনাশ—আর উপায় নাই। তখন তিনি উমিচাঁদকে ডাকিয়া যা-তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। উমিচাঁদ বলিলেন, "ষড়যন্ত্রকারীরা কেহই যুদ্ধ করিতেছেন না। কেবল মীর মদন আর মোহনলাল নামক দুইজন বাঙালী সেনাপতি লড়াই করিতেছেন। শুধু উঁহাদিগকে হারাইতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

ক্লাইব দেখিলেন, উঁহাদিগকে হারানো বড়ই দুষ্কর। হারাইতে গেলে শেষে নিজেকেই হারিতে হইবে। তিনি আর কি করেন—তাড়াতাড়ি তাঁহার দলবল লইয়া লক্ষবাগের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মীর মদন আর মোহনলালের গোলা সোঁ সোঁ করিয়া তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। মীর মদন, মোহনলাল আর সিন্‌ফ্রেঁ এই তিনজন বীর সেনাপতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে মীর জাফর, ইয়ার লতিফ আর রায় দুর্লভ যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া কামানে আগুন দিতেন, তাহা হইলে পলাশীর আমবাগানের মধ্যেই

সেদিন সদলবলে ক্লাইবকে চির-সমাধি লাভ করিতে হইত। কিন্তু তাহা আর হইল না। কেহই কিছু করিলেন না, তিনজনেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীর জাফর, ইয়ার লতিফ আর রায় দুর্লভের পঁয়তাল্লিশ হাজার ফৌজ, অথচ সে-দিন তাহাদের একখানা তরবারিও কোষমুক্ত হইল না।

হঠাৎ ইংরাজের কামান হইতে একটা গোলা আসিয়া মীর মদনের উরুতে লাগিল। মীর মদন আহত হইলেন। তখন সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নবাবের শিবিরে আনিলেন। নবাবকে দেখিয়া মীর মদন কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার কর্তব্য আমি শেষ করিয়াছি। সেনাপতি মোহনলাল আর সিন্‌ফ্রেঁ এখনও প্রাণপণে লড়িতেছেন। ইংরাজেরা পলাইয়া আমবাগানে ঢুকিয়াছে। কিন্তু আপনার প্রধান সেনাপতি মীর জাফর পঁয়তাল্লিশ হাজার ফৌজ লইয়া সঙের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কিছুই করিতেছেন না। আমি চলিলাম—বিদায়!"—বীর সেনাপতির শেষ নিশ্বাস অনন্ত বাতাসে মিশিয়া গেল।

মীর মদনের শোকে নবাবের চক্ষু সজল হইল—তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। পঁয়তাল্লিশ হাজার ফৌজ যাঁহার অধীনে সেই প্রধান সেনাপতি মীর জাফর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—সর্বনাশ! নবাব তখনই মীর জাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মীর জাফরের ভয় হইল, হয় তো নবাব তাঁহাকে এখনই বন্দী করিবেন। কিন্তু উপায় নাই, অগত্যা তিনি তাঁহার পুত্র মীরণ ও পাত্রমিত্রগণকে সঙ্গে করিয়া নবাবের শিবিরে আসিয়া দেখা দিলেন। মীর জাফরকে দেখিবামাত্রই নবাব তাঁহার রাজমুকুট খুলিয়া মীর জাফরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "সেনাপতি, এই লউন আলিবর্দীর রাজমুকুট—আপনি ভিন্ন এ-মুকুট রক্ষা করে এমন আর কেহ নাই। আজ মাতামহ জীবিত নাই, কিন্তু আপনি তো আছেন। আজ আপনিই আমার মাতামহের শূন্য স্থান পূর্ণ করুন। স্বর্গগত আলিবর্দীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার পবিত্র মুকুট রক্ষা করুন।"

মীর জাফর সসম্ভ্রমে রাজমুকুটকে কুর্ণিশ করিয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "সে কি কথা জাঁহাপনা? আমরা অবশ্যই শত্রুজয় করিব। কিন্তু আজ তো সন্ধ্যা হয়-হয়। আজ আর কিছুই হইবে না। কাল সকালেই আমরা ইংরাজদিগকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিব।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন, "ইংরাজেরা যদি রাত্রিকালে সহসা আমাদের শিবির আক্রমণ করে?"

মীর জাফর সগর্বে বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "আমরা তবে রহিয়াছি কেন জনাব? আপনি শুধু আজিকার মত মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার হুকুম দিন।"

নবাব সরল বিশ্বাসে বলিলেন, "তবে তাহাই হোক।"

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে মোহনলালের অনেক বারুদ ভিজিয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি ক্ষান্ত হন নাই, প্রাণপণে লড়িতেছিলেন। মুহুর্মুহুঃ তাঁহার কামানশ্রেণী গর্জিয়া উঠিতেছিল—গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্-ম্-ম্। মোহনলালের কামান-গর্জনে বাঙালীর শৌর্য, বাঙালীর বীর্য, বাঙালীর শক্তি, বাঙালীর ন্যায়পরায়ণতা, বাঙালীর প্রভুভক্তি, বাঙালীর দেশপ্রেম পলাশী-প্রান্তরের দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছিল। বাঙালী সেনাপতি মোহনলাল বীরবিক্রমে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্লাইব সে-আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ইংরাজদের পরাজয় হয়-হয়। এমন সময়ে সহসা নবাব আদেশ করিলেন, "আজিকার মত যুদ্ধ বন্ধ কর।"

বিরক্তিতে মোহনলালের কপালের শিরা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন, "আর দুই-চারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে। এখন কি যুদ্ধ বন্ধ করা যায়? এখন পিছন ফিরিলেই সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্বনাশ বাধাইবে। আমি ফিরিব না—যুদ্ধ করিব।"

মীর জাফর দেখিলেন, মহা মুস্কিল। মোহনলাল যদি আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তো ইংরাজদের দফা-রফা হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আবার নবাবের কাছে গেলেন। নবাব আবার বলিয়া পাঠাইলেন, "ক্ষান্ত হও। শিবিরে ফিরিয়া এস।"

রাগে দুঃখে মোহনলালের চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে সিপাহীদলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে ফিরিলেন।

মীর জাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ইংরাজেরা রক্ষা পাইলেন। মীর জাফর তখনি ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মীর মদন মারা গিয়াছে। অনেক কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া মোহনলালকে শিবিরে ফিরাইয়াছি। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হয় এখনই, কিংবা রাত্রি তিনটার সময় নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিবেন। তাহা হইলে সকল কার্যই সিদ্ধ হইবে।"

মীর জাফরের পত্র পাইয়া ইংরাজ সেনা আবার ধীরে ধীরে আমবাগান হইতে বাহির হইল। ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই পলাইতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁ আর বাঙালী বীর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সেনাদল হটিল না।

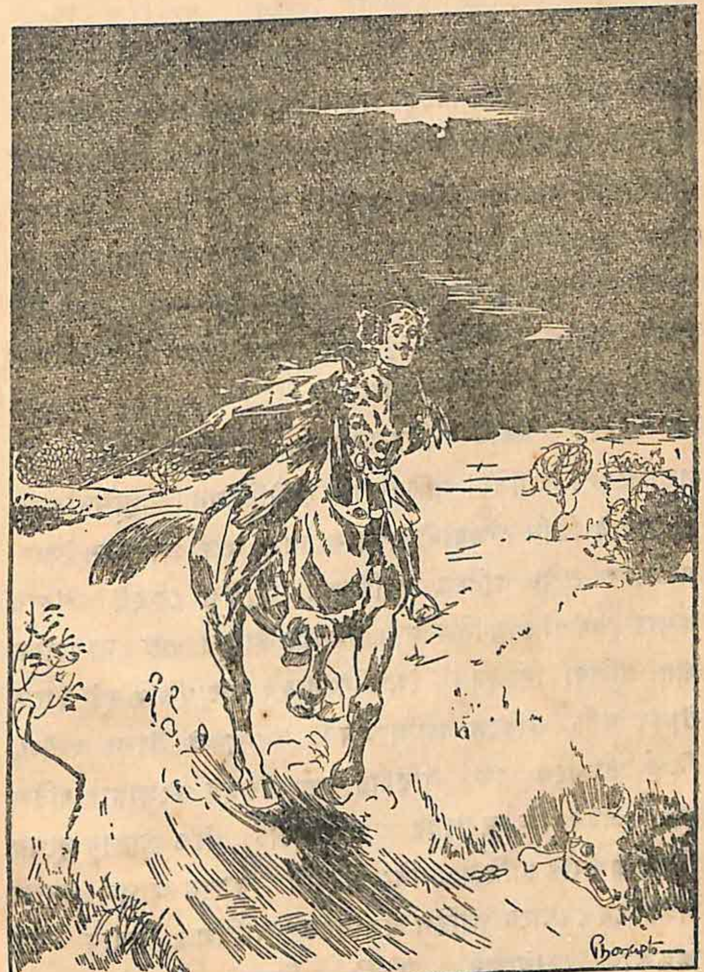
এদিকে রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি রায় দুর্লভ নবাবকে কেবলই পলাইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন, বাহিরে তাঁহার প্রকাণ্ড সৈন্যদল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবল ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রেঁ আর মহারাজ মোহনলাল তাঁহাদের অল্প কয়েকজন সৈন্য লইয়া প্রাণপণে লড়াই করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, পলাশীতে পরাজিত না হইয়া বরং মুর্শিদাবাদে যাইয়া

রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। রাজবল্লভ ক্রমাগত নবাবকে সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা শেষে আর ইতস্ততঃ করিলেন না, দুই হাজার অশ্বারোহী শরীররক্ষী সৈন্য লইয়া হাতীতে চাপিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোহনলাল আর সিন্‌ফ্রেঁ তখনও লড়িতেছিলেন। হঠাৎ একটা গোলা আসিয়া মোহনলালকে আহত করিল। হু-হু করিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। রক্তস্রাবে মোহনলালের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তথাপি তাঁহার গ্রাহ্য নাই। তিনি প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন।

মীর জাফর দেখিলেন, এই উপযুক্ত অবসর। তিনি তাঁহার দলবল লইয়া অগ্রসর হইলেন। মোহনলাল বুঝিলেন, মীর জাফর যদি তাঁহার বিপুল সৈন্য লইয়া ক্লাইবের সহিত যোগ দেন তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। বিকাল তখন পাঁচটা। অগত্যা মোহনলাল আর সিনফ্রেঁ বিরক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

ইংরাজসেনা মহাকোলাহল করিয়া নবাবের শূন্য পটমণ্ডপ অধিকার করিল।



॥ ৮ ॥

আহত মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নবাবের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের দিকে তাঁহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। প্রভুভক্ত মোহনলাল বুঝিয়াছিলেন, বিজয়ী শত্রুসৈন্য শীঘ্রই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া নবাবকে বন্দী করিবে। নবাবের আজ বড় দুর্দিন। তাই মোহনলাল নবাবকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাণপণে ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া চলিলেন। ঘোড়ার পিঠে চাবুকের উপর চাবুক পড়িতে লাগিল। তেজীয়ান ঘোড়া নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া চলিল।

এদিকে নবাব সিরাজদ্দৌলা পরদিন—শুক্রবার—সকালবেলা আসিয়া মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়াই তিনি রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। নবাব তাঁহার গুপ্ত ধনাগারের দ্বার খুলিয়া দিলেন। সৈন্য-সংগ্রহের জন্য তিনি দুই হাতে টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। অনেকেই টাকা খাইল, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কেহই তলোয়ার ধরিল না। এমন কি নবাবের শ্বশুর ইরীচ্ খাঁও তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন না। আপন আপন ধনরত্ন লইয়া যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। নবাব চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখনই শত্রুরা আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিবে; তখন আর তাঁহার

রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে তাঁহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, রাজধানীতে থাকিলে এখনই শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে—তাহা হইলে সিংহাসন উদ্ধারের আর কোন আশাই থাকিবে না। তাহার চেয়ে বরং আজ কোনরূপে পলাইয়া ফরাসী সেনাপতি মসিঁয়ে লা-সাহেবের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, পরে বিহারের শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের সাহায্যে ভবিষ্যতে একদিন হয় তো সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করা যাইতে পারে। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিরাজদ্দৌলা মসিঁয়ে লা-সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। শতসৌধকিরীটিনী মুর্শিদাবাদ, বড় সাধের হীরাঝিল প্রাসাদ, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মোগল রাজসিংহাসন—সব পিছনে ফেলিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ভিখারীর মত গোপনে রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কেবল একজন বিশ্বাসী অনুচর আর বেগম লুৎফউন্নেসা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটাইয়া মোহনলাল আসিয়া রাজধানীতে পৌঁছিলেন। দেখিলেন, রাজপুরী শূন্য, নবাব নাই। বুদ্ধিমান মোহনলাল বুঝিতে পারিলেন, নবাব নিশ্চয়ই মসিঁয়ে লা-সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানগোলার পথে পলায়ন করিয়াছেন। অমনি তিনিও

তাঁহার ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া ভগবানগোলার পথে তাহাকে ছুটাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইল। মুর্শিদাবাদের প্রকাণ্ড রাজপুরী আর আলোকমালায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল না। রাজ-বৈতালিকেরা আর নবাব সিরাজদ্দৌলার বন্দনা গাহিল না। নবাবের আদেশ পালনের জন্য আর দ্বারে দ্বারে রক্ষী-প্রহরী সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল না। প্রকাণ্ড অন্ধকার রাজপুরী যেন শ্মশানভূমির মত খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। সহসা সেই শ্মশানভূমি কাঁপাইয়া বিশ্বাসঘাতকশিরোমণি মীর জাফরের কামান গর্জন করিয়া উঠিল—গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্-ম্-ম্-ম্।

মুর্শিদাবাদ অধিকৃত হইল। মোতিঝিলের নবাবভবনে মহাসমারোহে মীর জাফরের অভিষেক হইল। ক্লাইব আসিয়া মীর জাফরের মাথায় সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন। নবাব হইয়াই মীর জাফর সিরাজদ্দৌলার নাবালক ভাই মেহেদী আলীকে বন্দী করিলেন, অন্তঃপুরের বেগমগণকে কারারুদ্ধ করিলেন, শেষে সিরাজদ্দৌলা ও মোহনলালকে ধরিবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইলেন।

এদিকে মোহনলালের শরীর অবিরত রক্তস্রাবে ক্রমেই অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তবুও তিনি প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার কপাল তখন ভাঙ্গিয়াছে। মোহনলাল ভগবানগোলায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই মীর জাফরের অনুচরেরা তাঁহাকে

ধরিয়া ফেলিল। প্রভুভক্ত মোহনলাল মীর জাফরের হাতে বন্দী হইলেন। মীর জাফর মোহনলালকে বন্দী করিয়া রায় দুর্লভের উপর তাঁহার বিচারের ভার দিলেন।

রায় দুর্লভ এক অন্ধকার কারাগারে মোহনলালকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সেখানে না আছে আলো, না আছে বাতাস ; টুঁ করিয়া একটু শব্দ হইলে দেওয়ালের গায়ে গম্-গম্ করিয়া সে-শব্দ বাজিয়া উঠে। সে যেন এক ভীষণ অন্ধকূপ।

অন্ধকার কারাগারে মোহনলালের দিন যায়। তিনি শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবেন আর ভাবেন। মনে তাঁহার শান্তি নাই, চিন্তায় তাঁহার শ্রান্তি নাই। তিনি কেবলই ভাবেন, হায়, এতদিনে নবাবের কি দশা হইল!—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা আজ কোথায় পথের ভিখারীর মত নিঃসঙ্গ হইয়া পলাইয়া ফিরিতেছেন! একদিন যাঁহার আদেশ পালনের জন্য লক্ষ নরনারী উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, আজ কি তাহারা কেহ তাঁহাকে এতটুকু কৃপা করিবে?—কে জানে!…

রায় দুর্লভ ঠিক করিলেন, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। একদিন তিনি মোহনলালকে হত্যা করিয়া তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিলেন। প্রভুভক্ত বীর মোহনলাল জানিতেও পারিলেন না যে, কেমন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ভিখারীর মত দিনের পর দিন

রাত্রির পর রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে পলাইয়া শেষে একমুষ্টি অন্নের জন্য ধরা পড়িলেন,—কেমন করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্ধকার কারাগারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্বাসঘাতক মহম্মদী বেগের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার ইহজীবনের শেষ যবনিকা পড়িয়া গেল।

সব ফুরাইল।—বাংলার আকাশ হইতে যেন সহসা এক ঝলক উজ্জ্বল আলোক নিবিয়া গেল।

মোহনলাল আজ স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কীর্তি, তাঁহার গৌরব, তাঁহার প্রভুভক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। যতদিন বাংলাদেশ থাকিবে—বাঙালী জাতি থাকিবে ততদিন মোহনলাল ও পলাশীর নাম কেহ ভুলিবে না। মীর জাফর, জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ প্রভৃতিও বাঙালী ছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহারা যে-পাপ করিয়া গিয়াছেন আজিও যেন বাংলা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

হায় মা বাংলা!

॥ ৯ ॥

বিধাতার আশীর্বাদে বাঙালীর—ভারতবাসীর জীবনের এক দুঃখময় ও লজ্জাকর অধ্যায়ের অবসান হইয়াছে, দেশ আবার স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু পলাশীর শিক্ষা আমরা যেন কখনও না ভুলি। হিংসাদ্বেষ, ভেদাভেদ ভুলিয়া আমরা যেন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। এখনও দেশের ও দশের জন্য আমাদিগকে অনেক কিছু করিতে হইবে।...

তাই উঠ, জাগ—মঙ্গলের পথে চলিয়া যাহাতে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে পার সেজন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর।...সব শুভ হউক!

বন্দে মাতরম্

শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক পরিদৃষ্ট ও পরিবর্ধিত।

